বড়দিন

শাশ্বতী চন্দ

মেদণ্ডের গোড়া থেকে ঘাড় পর্যন্ত ঝনঝন করে উঠল।
এতটা রাস্তা বাগানের ভিতর দিয়ে হাড়কাঁপানো হাওয়ায় বাইক চালিয়ে আসা। হত পা বশে নেই। তার ওপর বইটাও ওজনদার বেশ। মোটা, শক্ত মলাটে বাঁধানো ধর্মগ্রন্থ আমার হাতের আচমকা ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়েছেডানাভাঙা পাখির মতো, নির্বিবাদে শুয়ে আছে চিবোনো হাড়, ঝোলা মাথা টির টুকরো ও সিগারেটের ছাই-এর পাশাপাশি।
ভেবেছিলাম নু ফুঁসে উঠবে। মেয়েও তো তেজি নয় কম। কাঁচা বয়সে ওর পিছনে লাইন মারতে গিয়ে গালাগাল খেয়েছি এন্তার। একবার তো পা থেকে চপ্পল খুলে দেখিয়েছিল। বলেছিল, রোডসাইড রোমিওগিরি বের করে দেব। বামন হয়ে চাঁদে হাত ?
বামনই ছিলাম তখন। ন-মাসে ছ- মাসে বাড়ি আসা লোকটা, যাকে বাবা বলে জানতাম, চাকরি ভালো করলেও পয়সা কড়ি দিত না তেমন। চা বাগানের ভিতরে টিনের চাল আর বেড়ার দেওয়ালের দোকান দিয়েছিল মা। মাটির উনানে কাঠের ফালি ঘুঁজে মা চা বানাত, ঘুঘনিও। কাচের বোয়ামে সাজানো খাস্তা বিস্কুট, মিষ্টি বনটি। লেবারবা খেয়ে যেত কাজে যাওয়ার পথে, ফেরার পথে, কাজের ফাঁকে, ফুরসত পেলেই। আর আমি দুবার হায়ার সেকেন্ডারিতে গাড্ডু দুত্তোর বলে ছাড়ান দিয়েছি। ঘুরে বেড়াই, মস্তানি করি অল্পস্বল্প, আর করি মেয়েবাজি, নুর কথায় রোডসাইড রোমিওগিরি।
তবে নুও কিছু চাঁদ ফাঁদ ছিল না। খুব বেশি হলে টিউবলাইট বলা যেতে পারে। গায়ের রংটা সে রকমই সাদা আর শরীরটা পুষ্ট। বাগানের পাতাবাবুর মেয়ে। তাতেই অহংকারে গটগট করতে হাঁটে, মটমট করতে বাসে চেপে শিলিগুড়ির কলেজে পড়তে চায়। সে চাঁদই হোক আর টিউবলাইটই হোক, মধ্যকার দূরত্বটা থেকে যায়।
কিন্তু আজ নুর চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে যাই। রাগ কোথায় স চোখে দপদপ করছে চাপা হাসি। ঘাড়টা একটু বাঁকিয়ে বলল, তোলো।
---অ্যাঁ ?
---বাইবেলটা, তোলো।
যতটা সুন্দরী হলে ওই ঘাড় বেঁকিয়ে তাকানো ফাকানোতে একটা মেয়েকে মোহিনী মনে হয় ততটা সুন্দরীনু নয়। চটক যা ছিল তাও ঝরে গেছে এক মাসে। পাত্তা দিলাম না। বরং এগিয়ে এসে ওর ঘাড় ও পিঠের মাঝখানের খোলা জায়গায় ঘসে দিলাম দাড়িসুদ্ধ মুখ। নু সরল না। সহজ গলায় বলল, কই তোলো।
তাপ দ্রুত ছড়াচ্ছে শরীরে। পা বেয়ে উঠে আসছে নিষিদ্ধ উত্তেজনার হাতছানি। আরো একটু টেনে নিই নুকে নিজের দিকে। জড়ানো স্বরে বলি, কী যে ভ্যানতাড়া করো, এই সময়ে বাইবেল কী হবে?
---পড়ব। প্রত্যেকবার বড়দিনের আগের রাতে আমি বাইবেল পড়ি তোমরা পড়ো না ?
--- না। আমাদের কারো অত ধর্মিষ্টিপনা নেই। বাইবেল বাড়িতে ছিল একটা ছেঁড়াখোড়া। জানি না এখনো আছে নাকি দাদার ছেলের পটি পরিস্কার করতে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে----
আমার বাহু খামচে ধরে নু, ছিঃ তুমি খ্রিষ্টান না ?

--- তো? বাইবেল পড়তে হবে? স্কুলে মিস মছারী পড়াতেন না ঈশ্বরই প্রেম আর প্রেমে যে অবস্থান করে সে ঈশ্বরে অবস্থান করে--- বহুত ধুর জিনিস মাইরি।

আমার দাদুর বাবা লাল টালির গির্জাতে গিয়ে খ্রিস্টান হয়েছিল। এই বাগানের আরো অনেকেরই বাবা, ঠার্কুদা বাবার ঠাকুর্দার, ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার সঙ্গে। তখন খ্রিস্টান হলে অনেক সুবিধা পাওয়া যেত। ফি রোববার মাংস ভাত, টিফিনে প াউটি। তাছাড়াও পাওয়া যেত শীতকালে কম্বল।

অন্য হাতে নুকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করি। বলি, তুমি তো আর খ্রিস্টান নও। কেন পড়ো বাইবেল? কত ভড়ংই যে জানো।

হড়কে সরে যায় নু। আমার মোটরবাইকে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। ঈশ্বরের নাম নিই তাতে আবার ভড়ং কী? বড্ড বাজে মন তোমার।

---তা নাও না। কত ঈশ্বর আছে তোমাদের, শিব, কৃষ্ণ, কালী। আমাদের যিশুকে নিয়ে টানাটানি কেন বাবা?

---ঈশ। যিশু যেন ওনাদের সম্পত্তি। যে যিশুকে ভালোবাসে যিশু তার। আজ আমি তোমাকে বাইবেল পড়েশোনাব।

হ্যারিকেনটা রাখা টেবিলের ওপর। সামান্য আলোতে ঘরের ঝুপসো অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি। অস্পষ্টদেখা যাচ্ছে অ ালনায় এলোমেলো সাজানো কাপড়চোপড়, বুকসেল্ফে বই, দেওয়ালে ঝোলানো ছবিতে সমুদ্র। সোনালি ফেনা চকচক করছে। নুর মুখের একপাশটা অন্ধকার। বোঝা যাচ্ছে না ন্যাকামো করছে না লেজে খেলাচ্ছে। ওর অবশ্য একটু নান নান ভাব আছে।

সেদিন যখন প্রথম ওকে বাগে পেয়েছিলাম কারখানার পিছনে, শরীরের ওপর হামলে পড়ে মিটিয়ে নিচ্ছিলাম এতদিনকার জ্বালা। ও আমাকে আটকানোর চেষ্টা করেনি। বরং কাঁদছিল। ঝুলে থাকা মেঘলা আকাশের দিকেতাকিয়ে যিশুর নাম নিচ্ছিল। আবার ফিসফিস করে বলছিল পাপ, পাপ। আমি এলোমেলো সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। বলছিল াম, ভয় কী, কারখানা তো বন্ধ। এখানে কেউ আসবে না। আবার কখনো বলছিলাম, ভয় কী আর কদিন পরেই তো চাকরি পাচ্ছি। হুঁ হুঁ বাবা সরকারি। কোন শালা আমাদের বিয়ে আটকাবে?

ওরপরেও দু- একবার সুযোগ পেয়েছি অযত্নে বেড়ে ওঠা চা গাছের আড়ালে, খালি হয়ে যাওয়া কোয়ার্টারের পিছনে। বন্ধ চা বাগানে নিরিবিলি জায়গার অভাব কী। কোনোবারেই জোর করতে হয়নি খুব বেশি। কিন্তু পাপ পাপ বলে কান্ন াকটি করতেও ছাড়েনি। ন্যাকামো। তবে প্রতিবার তা করেছে সব কিছু চুকেবুকে যাওয়া পর। এবার তো শু থেকেই চলছে এইসব। এমন নিরাপদ, দরজা বন্ধকরা অবসর কতদিন অপেক্ষার পর মিলেছে। আর কোনওদিন মিলবে কিনা কে জানে। কারণ রোজ তো নুর বাড়ির লোকেরা যুবতী মেয়েকে একা ঘরে রেখে রাতভোর আত্মীয়বাড়িতে কাটাবে না। আর লুকিয়ে চুরিয়ে যতবারই হোক না কেন সে যেন সুখাদ্য গপ্ গপ্ করে গেলা। তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার মজাই আলাদা। সব কিছু যখন ঠিকঠাক চলছে, সমস্ত শরীর টান টান হয়ে আছে নিষিদ্ধ উত্তেজনার স্বাদ নেওয়ার জন্য, ওরই ওইরকমই হওয়া উচিত। কারণ ব্যবস্থাটা দুজনে মিলেই নিয়েছি। এখন এই ঢং মানা যায়?

দরজা, জানালা টাইট করে বন্ধ। ভেন্টিলেটারের ফাঁকফোঁকরও আটকানো পিচবোর্ডের বাক্স দিয়ে। তবু বহুদিন সংস্কার না হওয়া কোয়ার্টারের অজস্র ছিদ্র দিয়ে ঢুকে পড়ছে মাঝে মাঝেই শীতল বাতাস। হঠাৎ হঠাৎ ছোবলে মেদ মাংস ভেদ করে হাড়ে পৌঁছে যাচ্ছে শীত। নুর দিকে হাত বাড়াই। কিন্তু হাত কিছুটা বাতাস হাতড়ে ফিরে আসে। কারণ নু নিচু হয়ে ব াইবেল তুলছে। বাইবেল বুকে চেপে ধরে বিছানার দিকে এগোয় সামান্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

বিছানায় বসে নু এক পা ঝুলিয়ে। ধরতে ডাইভ দিই। তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ি নুর জখম পায়ের ওপর। চিৎকার করে ওঠে রানু। তাড়াতাড়ি সরতে যাই। হাতের ধাক্কা লেগেছিল বোধহয়। উল্টে গেলমাংসের ভাঁড়। নীল ফুলছ াপ চাদরে লাল ঝোলের আলপনা।

স্থির চোখে তাকায় নু, এটা কী হল?

হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকি। নুর বারণ সত্ত্বেও বিছানায় খবরের কাগজ বিছিয়ে বসে খেয়েছি দোকান থেকে আনা টি ম াংস। এখন যদি নু রাগ দেখায়ই কিছু বলার থাকে না। কাল বিকাল নাগাদ ফিরে আসবে ওর বাড়ির লোকেরা। তার অ াগেই সব পরিষ্কার করে রাখতে হবে। চোখের পাতা না কাঁপিয়ে মিথ্যা কথা বলাটা নুর যে আসে না। পেরেকেরখোঁচায় ওর পা পেকে ফুলে ঢোল। চাদর কাচা তো দূর, নড়তে চড়তেই কষ্ট।

আচমকা ধাক্কায় পাগলামির ঝোঁকটা কেটে যায়। খারাপও লাগে একটু। কেন যে এত অসাবধানী আমি। পেরেকের খোঁচ াটাও লেগেছে আমার জন্য। খারাপও লাগে একটু। কেন যে এত অসাবধানী আমি। পেরেকের খোঁচাটা লেগেছে আমার জন্য। রায়বাবুদের খালি কোয়ার্টারের বারান্দায়। এর মধ্যে কতগুলো পেরেক বিপজ্জনকভাবে বেরিয়ে ছিল। হুড়োহড়ির সময় ওর একটা নুর পায়ের পাতায় ঢোকে।

নুর ফুলে ওঠা পায়ে আলগা হাত বোলাই। বলি, ভালো ডাক্তার দেখাচ্ছো না কেন? এরপরে কিন্তু বিপদ হয়ে যাবে। নন্দু ফন্দুকে দিয়ে চলে?

অল্প হাসে নু। বলে, বাগানে ডাক্তার কই? ডাঃ সেন তো আগেই তল্পিতল্পা গুটিয়েছে। নন্দুও আর বেশীদিন নেই। শুনলাম ও নাকি দেশে চলে যাচ্ছে।

ডাঃ সেন বাগানেরই ডাক্তার। বাগান বন্ধু বলে বেতনও বন্ধ। তবু টিকেছিলেন আরো কিছুদিন, বাগান আবার খুলবে এই আশাতে হোক অথবা বাগানের মায়াতেই হোক। কিন্তু মাস দুয়েক হল তিনি চলে গিয়েছেন। সোনাপুর না বারাসাত কে াথায় যেন বাড়ি। নন্দু পাশ করা ডাক্তার নয়। লেবার খাটানোর কাজ করত। আর করত শখের হোমিওপ্যাথি। টুকটাক ক াজ চালাত। ভালোই করছে চলে যাচ্ছে। থেকেই বা করবে কী। সকলেই তো যাচ্ছে একে একে। কারখানার গেটে তালা ঝুলিয়ে মালিক, ম্যানেজার রাতারাতি পালিয়েছে কলকাতায়। একটু উঁচু দরের চাকুরে যারা পাওনাগণ্ডা মিটবে এই অ াশাতে ইউনিয়নের দরজা ধরে পড়েছিল কিছুদিন, এখন কপাল চাপড়ে দিয়ে সরেপড়ছে যে যার মতো। থেকে গিয়েছে শুধু নুদের মতো কয়েক ঘর যাদের কোথাও যাওয়ার নেই। আর আছে লেবারগুলো।

আমি বলি, বাগানে নেই তো কী? শিলিগুড়ি গিয়ে দেখাবো।

---গাড়ি ভাড়া দিয়ে শিলিগুড়ি যাওয়া, আবার দেড়শো টাকা ভিজিটের ডাক্তার দেখানো? আমার বাবার এখন আর অত টাকা নেই গো।

---শিলিগুড়ি গিয়ে বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়ার সময়ে তো টাকা থাকে ঠিক।

অল্প হাসে নু ---ও গড। তুমি ভাবছ বাবা মা নেমন্তন্ন খেতে শিলিগুড়ি গিয়েছে? ধুস। ওরা গেছে তেল দিতে। মাসিরা খুব বড়লোক। মেসোমশাই -এর পেট্রোল পাম্প আছে। আরো কী সব ট্রাক ফ্রাক---

--- তো? টাকা দেবে?

---না। দান খয়রাত করার লোক ওরা নয়। বড়জোড় ভাইটার একটা হিল্লে করে দিতে পারে। নিজের ব্যবসায় হোক, চেন াশোনা কারো ব্যবসায় হোক---

---ভাই মানে পল্টু ?

---পল্টু, সন্টু দুজনকেই। না হলে আর চলে না। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে তুলে আর কদ্দিন --- ব্যাঙ্কেই আরকী বা আছে -- - যা খরচের হাত ছিল বাবার। কেন যে বাগানাটা বন্ধ হল, ভাল্লাগে না ছাই।

আমি চিত হয়ে শুয়ে দেখি রং চটা ছাদ, আদ্যিকালের ফ্যান, ঝুল মাকড়শার জাল। ভাল্লাগে না। সত্যিই ভাল্লাগে না। শুধু এই বাগানই নয়। আশেপাশের অনেক বাগানেই নয়, আশেপাশের অনেক বাগানেই তালা ঝুলছে আস্তে আস্তে। কেন, কী জন্য, জানি না। কার বা কাদের দোষে এরকম হচ্ছে, তাও জানি না। শুধু জানি চারপাশের মানুষগুলোর মুখ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে হঠাৎ করে। ইদানীং মাঝে মধ্যেই কানে আসছে বুধনের বাবা ইঁদুর মারা বিষ খেয়েছে, মোড়ের বট গাছে ঝুলছে শুকদেবের শরীরটা। খিদের জ্বালায় বুনো ফল খেয়ে কারো পেটের অসুখ সারছে না। মার দোকানটাও উঠে গেছে। ভ াতই জোটে না তো চা, ঘুঘনি খাবে কে। দোকান অবশ্য এমনিতেও উঠত। ইতানীং মা আর পেরে উঠছিল না। দরকারও নেই তেমন। বছর দুয়েক আগেই দাদা হাইওয়ের পাশে হোটেল খুলেছে। ভাত, মাংস, ডিমের ঝোল, টি তরকা সব মেলে। রাতের দিকে দেশি মদও। দূরপাল্লার ট্রাক ড্রাইভাররাই দাদার লক্ষ্মী। টাকা পয়সা ভালোই আনাগোনা করে দাদ ার হাতে।

মাঝে মাঝে এও মনে হয় ভাগ্যিস বন্ধ হয়েছিল বাগানটা। না হলে পাতাবাবুর টিউব লাইটের মতো সাদা,ডাঁটো চেহারার মেয়েটা কি আমার হাতে আসত? তবে এর সঙ্গে আরো কয়েকটা ভাগ্যিস আছে। ভাগ্যিস ছ-মাসে ন- মাসে বাড়িতে অ াসা বাপটা মরেছিল। ভাগ্যিস রেলের চাকরি করত লোকটা। ভাগ্যিস আর দু-চার বছর পরে মরেনি। বাপ চাকরি করতে

করতে মরলে চাকরি ছেলে পায়। দাদার হোটেল আছে। দাদা তো চাকরি নেবে না। তাই না আমার এত বোলবোলা। সরকারি চাকরি জেল্লাই ব্যাপক। এখনও পাইনি তাতেই আশেপাশের লোকের তাকানোই বদলে গেছে মাইরি। নুও কি ত া না হলে এমন ভোল পাল্টাতে? আট মাস ধরে বাপের রোজগার বলে কিচ্ছু নেই।বাগানের বাচচাগুলোকে পড়াত নু। সে কাজটাও ওর গেছে। এ সময়ে কে আর পড়াশোনা করছে? চাকরিটা হলেই আমি ওকে বিয়ে করে নিয়ে এখান থেকে চলে যাব এই আশাতেই না নু আমাকে পাত্তা দিচ্ছে। তাছাড়া আর কীবলব? নু না হয়ে অন্য মেয়ে হলে বলতাম শরীরের নেশ া।

কাত হয়ে শুই। আমার চোখের সামনে এখন নুর গোলাপি মাক্সিতে ঢাকা উ। বালিশে হেলান দিয়ে বসেছে নু। হাতে ব াইবেলটা আছে কিনা জানি না। আছে নিশ্চয়। তা না হলে বলবে কেন, আমি পড়ি তুমি শোনো?

চাপা পড়া লোভটা আবার মাথা ঝাঁকাচ্ছে ভীষণভাবে। কেন যে এত ধ্যাষ্টামো করছে মেয়েটা। জোর কিকরতে পারি না? পারি। তবে জোর করে পাওয়ার মধ্যে মজাই নেই। বরং ভোলার চেষ্টা করে দেখি। ওর হাতের পাতা মুঠো করে ধরলাম-- - আমাদের হোটেলের জিনিস আনতে মাঝে মাঝেই শিলিগুড়ি যেতে হয়। এবার তোমাকে নিয়ে যাব। ডাক্তার দেখাব অ াগে। তারপর ঘুরব। রেস্টুরেন্টে খাব।

হোটেলটা দাদার। আমি ফাইফরমাস খাটি মাত্র। দাদা দুবেলা খেতে দেয়। মালপত্র আনতে গিয়ে যে দু-চার পয়সা সর াতে পারি তাতে পকেটে খরচা ওঠে কোনওমতে। খুব বেশিও হয় না। কারণ দাদা খুব সেয়ানা। টাকা পয়সা গুনে গেঁথেই দেয়। তবু কারো সামনে আমাদের হোটেল বলে র‍্যালা নিই। যেমন আজকাল চাকরির র‍্যালা নিচ্ছি। এমন ভাব করি যেন চাকরিটা হয়েই গেছে। কেউ বা মুষড়ে যায়। শুনছি না শুনছি না ভাব করে সরে যায় মেয়েদের চোখ চকচক করে আবার। মেয়ে পটাতে গেলে একটু আধটু মিথ্যে বলতেই হয়। তাতে দোষের কিছু নেই।

---আই শুনছো --- আমার গায়ে ধাক্কা দেয় নু --- শোনো আমি পড়ছি।

---উঁহু কী শীত বলে আমি লেপটা টানি।

---যিশু বলেছেন, সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করো, কারণ যাহা ধবংসে লইয়া যায় সেই পথ প্রশস্ত ও সুপরিসর, আর অনেকে তাহা দিয়া প্রবেশ করে। কিন্তু যাহা জীবনে... সেই পথ---

---ধুত্তোর। জ্যাকেটসুদ্ধ তলিয়ে যাই লেপের ভিতর। মাথার ওপর দিয়ে লেপ টেনে দিই।

---ভণ্ড ভাববাদীদের বিষয়ে সাবধান। তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আসে কিন্তু অন্তরে তাহারা লোলুপ নেকড়ে বাঘ---

লেপের ভিতর জমাটবাঁধা অন্ধকার। ভয়ংকর শীত পড়েছে। এমন শীতের রাতের লেপের নরম আদর, সুখক্রীড়া ছেড়ে সে াজা হয়ে বসে বাইবেল পড়া। মেয়েটের মাথায় নির্ঘাত ছিট আছে। লেপটা ওর কোলের ওপর দিয়ে বিছিয়ে দিই। ত ারপর নিজের মুখটা গুঁজে দিই ওর কোলে। আস্তে আস্তে টানতে থাকি ওর শরীরটাকে। সাড়াশব্দপাই না বিশেষ। হল কী। বাইবেল পড়ার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে না।

মুখ বের করে দেখি নু পাথরের মতো বসে আছে।

---কী হল?

---কান্না। শুনছো?

---টুটুর মার।

ঘুনঘুনেনে একটা গোঙ্‌নির আওয়াজ দেয়াল ভেদ করে ঢুকে পড়ছে ঘরে। পাক খাচ্ছে কী বিপদ! আগে বাইবেল। এখন ক ান্না।

---কাঁদছে কেন?

---বিকালে টুটুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। ট্রাকের সঙ্গে। সাইকেলসুদ্ধ ঢুকে গিয়েছিল ট্রাকের তলায়। --- আচ্ছা তুমি কি কোনও খবরই রাখো না?

---ট্রাকের সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট? সে তো অনেক দূরে হয়েছে, সেই পুলগঞ্জের মোড়ে। ওইটুকু ছেলে ওখানে সাইকেল নিয়ে গিয়েছিল? বাঃ ছেলের তো বেশ উন্নতি হয়েছে।

আবার শোওয়ার উপক্রম করি। হালকা হাতে টান দিই নুকেও। ফস্ করে রেগে ওঠে নু।
---নিজের ধান্দা ছাড়া আর কিছু বোঝে না, না? একটা বাচচা ছেলে মরে গেল---
জ্ঞান দিচ্ছে দ্যাখো।--- তা তুমি কোন সমাজসেবাটা করছ? বসে বসে বাইবেল পড়লে কার কোন উপকার হচ্ছে?
হঠাৎই সব কিছু আলুনি লাগতে থাকে। এই ঠান্ডায় এতদূর বাইক চালিয়ে আসাটা ফালতু মনে হয়। বুম্বা, সন্টুরা পিকনিক করছে। ওদের সঙ্গে পিকনিক করলেই ভালো হত। এখনও যাওয়া যায়। যাব? ঠান্ডায় অতটা রাস্তা যেতে কষ্ট হবে ঠিকই তবে এই প্যানপ্যানানি থেকে তো ভালো।
টান মেরে লেপ সরাই। সোজা হয়ে বসি। হ্যারিকেনের আলোটা কেমন যেন ঘোলাটে ঘোলাটে। চিমনিটা অপরিষ্কার বলেই কি। ঘরের অন্ধকার কাটেনি পুরোপুরি। চিমসে অন্ধকার ঘাপটি মেরে বসে আছে এখানে ওখানে। ঘ্যানঘ্যানে কান্নাটা যেন অন্ধকারটাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিল। সোজা হয়ে বসি। পা বাড়াই নামবার জন্য। নু আগের মতোই সোজা বসে। আমাকে বোধহয় খেয়ালই করে না। নিজের মনেই বলে, টুটুর মার জন্যই খারাপ লাগে। কয়েক মাস আগেই টুটুর বাবাটা বেঘোরে মরল। এখন টুটুটাও---
টুটুর বাবাকে আমি চিনতাম। ফ্যাক্টরির দারোয়ান ছিল। এই গ্রীষ্মেই ডিউটি দেওয়াকালীন সাপের কামড়ে মরে। ক্ষতিপূরণ দিচ্ছি দেব করে অনেক সময় কাটিয়ে দিল মালিকপক্ষ। তারপরে তো তালাই ঝুলল বাগানে।
---টুটুর একটা দিদি ছিল না? বেশ ভালো দেখতে, কী যেন নাম, রেশমী না রেশমা-- ও কোথায়?
--- রেশমী। ও তো পালিয়ে গেছে। একটা বিহারি ছেলে খুব ঘুরঘুর করত। তার সঙ্গেই। তাও তো হয়ে গেল মাসখানেক। এটাও জানতে না, না?
---কোন মেয়ে কার সঙ্গে পালাচ্ছে সেটা জানা আমার কাজ নাকি? অদ্ভুত তো।
বললাম ঠিকই তবে জানি তো সবই। রেশমীর খবরটা ঠিকঠাক না জানলেও অনেক মেয়ের খবরই জানি।বাগানের অনেক অল্পবয়সি মেয়েই প্রেমিকের হাত ধরে শহরে পালিয়েছে। তারা আদৌ ঘর বর পেয়েছে না বিক্রি হয়ে গেছে কে জানে। যারা ততটা অল্পবয়সি নয় তাদের অনেকেই শহরে যায় রোজ। কেউ বলে দোকানে কাজ করি,কেউ বলে বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে মাল বেচি। অনেকে বলে মাল না ছাই ওরা শরীর বেচে। পাতলা সিন্থেটিকের শাড়ি, চড়া লিপস্টিক, সাজের ঘটা দেখে তো তাই মনে হয়। একেক সময় মনে হয় বেশ করে শরীর বেচে। না খেতে পেয়ে মরার চেয়ে তো ভালো। আবার কখনো কখনো খারাপ লাগে খুব। ছোটোবেলা থেকেই দেখছি এদের। কারো সঙ্গে ভাব ছিল। টুকটাক ফস্টিনস্টিও করেছি কারো কারে সঙ্গে। এরা শহরে গিয়ে রোজ রোজ নোংরা হয়ে ফিরছে তাও শুধু সামান্য খাওয়ার জন্য এটা ভাবতেও মাথার ভিতরটা গোলমাল হয়ে যায়।
সেজন্যই আজকে মীনাকে ডেকে নিয়েছিলাম। আমাদের হোটেলের সামনে দাঁড়িয়েছিল বাস ধরবে বলে। ওর উৎকট সাজ দেখে খারাপ লাগছিল। তার চেয়েও বেশি খারাপ লাগছিল ওর শুকনো মুখ দেখে। তাই ও যখন বলল, কী রে খুব হোটেল বাবু হয়েছিস। খাওয়াবি না কিছু? আমি আর না করতে পারিনি। ওকে খাইয়েছি। যত্ন করেই। বেশি কিছু না। চারটা টি আর অল্প একটু চিকেন। দাদার বুঝতে পারার কথা না। তবে ওই বুধুয়া ব্যাটাচ্ছেলেটা চুকলি কাটল। দাদা এসে ব্যাপক হম্বিতম্বি করল--- মেয়েবাজি করতে হয় তো নিজের পয়সায় কর। শালা দুশ্চরিত্র। মুখ দেখলেও পাপ হয়।
আমারও মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। দিয়েছি দু-কথা শুনিয়ে। দু-কথায় চার কথা। চার কথায় আট কথা। তুমুল হট্টগোল। লোকজন জমে গেল। ঝড়াকসে একটা নোটের বান্ডিল আমার সামনে ফেলল দাদা। সবাইকে শুনিয়ে বলল, নে, পাঁচহাজার দিলাম। এটা নিয়ে রাস্তা দ্যাখ। এই হোটেল আমার। এখানে যদি ভাস বসাতে আসিস মেরে খালপারে পুঁতে রাখব। দূর হ।
প্রথমটায় খুব রেগে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল সব ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করে দিই। তারপরে কষ্ট হয়েছিল। এভাবে বলল দাদা? দাদার খাই, দাদারটা পরি ঠিকই তবে মাগনা তো নয়। অনেক কাজ করে দিই। হোটেলের ভাগও তো চাইনি। ভেবেছিলাম টাকাটা নেব না। পরে মনে হল কেন নেব না। এ দু-বছরে হোটেলের জন্য আমিও তোখাটি নি কম। টাকাটা তুলে বাড়ি চলে আসি। চুপচাপ শুয়ে থাকি সন্ধ্যা পর্যন্ত। সাড়া পেয়ে দাদার ছেলেটা এসেছিল। অন্য দিন হলে ঘাড়ে পিঠে তুলে নিতাম। আজ ঘেন্না হল। শুয়োরের বাচচা আটটা নাগাদ উঠে হোটেলে যাই। দাদা ছিল না। বুধুয়া ছিল। ওকে

দেখিয়ে দেখিয়ে একতাড়া টি প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরি। দুজনের মতো মাংস নিই ভাড়ে। টাকার বাণ্ডিল থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে ছুড়ে দিই বুধুয়ার দিকে--- নে টি মাংসো র দাম। তারপরে সোজা চলে আসি নুর কাছে।
আমার জ্যাকেটের হাতাটা আঁকড়ে ধরে নু --- আমার খুব ভয় করে।
দমবন্ধ হয়ে আসে। কাটানোর জন্য জোরে জোরে হাসি--- কেন, ভয় কীসের?
---সব যেন কেমন বদলে যাচ্ছে---
---তো। মানুষ তো বদলায়। আমরাও বদলাব।
ফিসফিস করে বলে নু, শুধু কি মানুষ? সব কিছুই তো--
হঠাৎ, কোন ভাবনা চিন্তা না করেই বলে বসলাম, চলো, পালাই। পালাবে?
বেশ জোরেই হাসল নু---একাই খেতে পায় না তায় আবার শঙ্করাকে ডাকাডাকি। পকেটে আছে কত?
---চার হাজার নশো। কুড়িয়ে বাড়িয়ে আরো দু-একশো হয়ে যাবে মোটরবাইকটা সেকেন্ডহ্যান্ড। তবু এখনও বিক্রি করলে হাজার দশেক পাওয়া যাবে।
ফুটো পকেটের খবর প্রেমিকাকে জানাতে নেই। সন্টু বলে। তা হলেই নাকি হয় পাখি উড়ান দেবে, না হয় আপারহ্যান্ড নেবে। আমিও মানি সেটা। তুব আজ আগে ভাগেই ভকভক করে বলে দিয়েছি।।
---কিন্তু সব মিলিয়েই বা সে কত? কত দিন চলে এতে? তারপর?
নুর ছোটো ছোটো চোখগুলো যেন দপ করে জ্বলে উঠল। হয়তো আমারই মনের ভুল।
---তারপর আর কী? তোমার চাকরি? তোমার রেলের চাকরি। তোমার বাবার জায়গায় যেটা হবে। জনে জনে তো কম গল্প শোনাওনি চাকরির।
নুর অশ্বত্থপাতার মতো গালে আবছা আলো। গলায় কী বিদ্রূপ বুঝতে পারছি না। আর পারছি না বলেইবিরক্ত লাগছে খুব। বাইরে শীতের হাওয়া বইছে। কান পাতলে হু হু শব্দ পাওয়া যায়। মাঝে মাঝেই একটি দুটি শীতে কষ্ট পাওয়া পাখি ডেকে উঠছিল কেমন যেন অস্থির লাগছে।
একটা গোল আলো সিলিঙের কাছে ঝুলে আছে। একবার চিত হয়ে শুলাম। তারপরেই আবার উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে দিলাম বিছানায়। বলব? সব কথা কি বলা যায়? এতদিন সকলকে মিথ্যা কথা বলে এসেছি সে কথা বলব। পুরোপুরি মিথ্যা অবশ্য বলিনি। তখন তো জানতাম চাকরিটা আমারই হবে। পাঁচ ছয় মাস এই ভরসাতেই তোছিলাম। সন্টুকে নিয়ে গেলাম একদিন অফিসে খোঁজখবর করতে। জানতে পারলাম আমরা কেউ নই। বাবার আগে থেকে একটা সংসার ছিল। ছেলে আছে একটা, দুটো মেয়েও । ভীষণ মন খারাপ নিয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু ততদিনেখাতির পাওয়াটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, সেই খাতির ভাঙিয়ে কিছু কিছু সুবিধা লুটে নিতেও। বলিনি কাউকে। বলতেপারিনি আসলে। সন্টুকেও বারবার করে বলেছিলাম কাউকে যেন না বলে। সন্টুর ওপর ভরসা আছে আমার। যদিওজানি খুব বেশি দিন ফাঁকি দিয়ে চালানো যাবে না। তবে বলবই বা কী? আমার মা আসলে রক্ষিতা ছিল একজনের।একথাও কি বলা যায়? তবে বলতে ইচ্ছা করছে খুব। একজনকে। কোনও একজনকে। এই লুকিয়ে লুকিয়ে কষ্ট পাওয়া ভালো লাগে না।
বললাম। সবটুকুই। কোনো কিছু বাদ না দিয়ে। তারপর শুয়ে রইলাম বিছানায় পিঠ দিয়ে লেপের ওপর। পা মাটিতে, কোমর থেকে মাথাটা বিছানায়। প্রতি মুহূর্ত অপেক্ষা করছি কখন নু গালাগালগুলো শু করবে। কিংবা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে ঘর থেকে। এমনটাই করা উচিত হবে চাকরি হবে বলে আগাগোড়া ফাঁকি দিয়ে এসেছি। কিন্তু দিচ্ছে না কেন এখনও।
ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি নু বসে আছে চুপ করে। চোখ খোলা বাইবেলের পাতায়। হঠাৎ হাত বাড়ালাম। নুরকোলের ওপর থেকে হাত তুলে দিলাম। মনে হল নুর হাত কাঁপছে। মনে হল আমার হাত খুব গরম। আস্তে আস্তে ডাকলাম---অ্যাই। খারাপ লাগল? এই জন্যই তো বলতে চাইনি।
---বলাবলির আছেটা কী? জানতাম তো। অনেক দিন আগে থেকেই।
লাফিয়ে উঠি -- কে বলেছে? সন্টু ? হতচ্ছাড়াকে আমি যদি না--- কিন্তু জানতে তুমি? জেনেও এতদিন ধরে- কেন?
মাথার ভিতরটা এলোমেলো হয়ে যায়। একটা হাঁটু তুলে বসেছে নু। মুখটা হাঁটুর ওপর নামানো। মুখ দেখা যাচ্ছে না।

এখন আলো ওর মাথার পিছনে, এলোমেলো চুলে ঠিকারোচ্ছে। আরেকটা পা লম্বা করে রাখা। সে পায়ের পাতায় মস্ত একটা ক্ষতচিহ্ন। অনেক ধুলো জমেছে সেখানে, অনেক নোংরা।

নু বলে, বাইবেল পড়ি এসো। জানো না কাল বড়দিন? এইভাবে যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও। কারণ তিনি ভালোমন্দ সকলের উপর তাঁহার সূর্য উদিত করেন, ধার্মিক ও অধার্মিকের উপরে বৃষ্টি বর্ষাণ।

এখন আমি কোথায় যাই, কোথায় বসি, কোথায় গিয়ে কাঁদি?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com